ছবি ও গল্প



যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ :
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

ছবি ও গল্প

সূচীপত্র



আবাহন

কুসুমিত বন, করিয়া চয়ন
ভরিয়া কুসুম-ডালা,
নবীন মুকুলে, হাসিমাখা ফুলে
গাঁথিয়া এনেছি মালা।
আদরের ধন, শিশির শোভন
এ নব কুসুম-হার,
ধীরে কাছে এসে, সুমধুর হেসে
লয়ে যাও উপহার !

ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ

আমাদের গোবর্ধন, ওরফে গোবরা, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াই ভিখারি হইয়াছিল। একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া সে একটিমাত্র পয়সা পাইল ; পয়সাটি লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে, এমন সময় ভিখারির মত কাপড় পরা এক দেবদূতের সহিত দেখা হইল। দূত বলিলেন, 'ভাই, সারা সকাল ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখনও দুটি অন্ন জুটলো না ! তোমার কাছে যদি কিছু থাকে, দাও না দাদা ?'



'আরে ভাই, আমারও প্রায় সেই দশা ! এই একটি পয়সা পেয়েছি, তা তোমার যদি দরকার থাকে, এইটেই নেও।' এই বলিয়া গোবরা দূতকে পয়সাটি দিতে গেল।

ভিখারির উদারতা দেখিয়া দূত বলিলেন, 'বাঃ, তোমার প্রাণটা ত বেশ শাদা ! সরল লোককে আমি বড় ভালবাসি। চল, আমরা দুজনে দিন কয়েক ঘুরে-ফিরে আসি।'

গোবরা। সে ত বেশ কথা, চল, বিদেশে গেলে ভিক্ষেও মিলবে ভাল।

দূত। তা ছাড়া, আমি একটা বিদ্যে জানি, তাতেও দরকার মত কিছ কিছু পাওয়া যাবে। আমি খুব শক্ত অসুখ সারাতে পারি আর মরা লোককেও বাঁচাতে পারি।

গোবরা। তবে ত খুব মজা, চল।

সেই দিনই দুই জনে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। তার পর ক্রমাগত কয়েকদিন চলিয়া তাঁহারা এক গ্রামে আসিয়া শুনিলেন যে, সেখানকার এক কৃষকের ভারি অসুখ। দেবদূত কৃষকের বাড়িতে গিয়া তাহার স্ত্রীকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'কোন ভয় নেই, অসুখ আমি সারিয়ে দেবো।' এই বলিয়া ঝুলির ভিতর হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া কৃষককে খাইতে দিলেন। সেই ঔষধের এমনি গুণ যে, খাইবামাত্র সে আরোগ্য লাভ করিল এবং বেশ সহজভাবে চলা-ফেরা করিতে লাগিল।

বলিতে গেলে, এক রকম যমের দুয়ার হইতে স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া কৃষকের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না ! কৃষকও আহ্লাদে আটখানা ! তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রীতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে দেবদূতের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল, 'বাবা ! তোমার দয়াতেই আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। তুমি আজ যে উপকার করলে, তা জন্মেও ভুলব না। কিন্তু বাবা, আমরা বড় গরিব। আমাদের কিছু নেই, যা দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করতে পারি। থাকবার মধ্যে—এই একটা ছাগলছানা ! এইটে নিয়ে আজ আমাদের মাপ কর !'

দেবদূত। না না—আমি কিছুই চাই না। ও ছাগলটি তোমাদেরই থাক !

কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। 'দোহাই বাবা ! আমাদের অনুরোধ রাখতেই হবে'—বলিয়া উভয়ে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল।

এত কাকুতি মিনতিতেও দূত ছাগলছানা লইতে অস্বীকার করিতেছেন দেখিয়া গোবরার আর সহ্য হইল না। বিশেষ—সেই নধর পাঁঠাটির উপর তাহার বড় লোভ পড়িয়াছিল। সে দূতকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি এত বোকা কেন ? খিদেয় পেটের নাড়ি হজম হচ্ছে, এ সময় ভাগ্যগুণে যদি বা কিছু জুটল, তাও তুমি নিতে চাও না ! এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে কখনও ভাল হবে না।' এই বলিয়া পাঁঠাটি লইবার জন্য সেও খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

শেষে কিছুতেই তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দেবদূত পাঁঠার ছানাটি গোবরার স্কন্ধে চাপাইয়া সে স্থান হইতে বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক দুপুর বেলা তাঁহারা এক জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। তখন দূত বলিলেন, 'তুমি এখানে রান্নার আয়োজন কর, আমি স্নান করে আসি। ফিরে এসে দুজনে এক সঙ্গে খাবো।' এই বলিয়া দেবদূত স্নান করিতে গেলেন।



এদিকে গোবরা পাঁঠাটি রাঁধিয়া বসিয়া আছে, দূত আর আসেন না। মাংসের সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল। গোবরার মুখ দিয়া টসটস করিয়া লাল ঝরিতে লাগিল। তবুও দূতের সাক্ষাৎ নেই। শেষে কিছুতেই আর লোভ সামলাইতে না পারিয়া, সে হৃৎপিণ্ডটা বাছিয়া খাইয়া ফেলিল। তার পর গোবরা মুখ মুছিতেছে, এমন সময় দূত আসিয়া উপস্থিত! দূত পূর্বেই তাহার কীর্তি জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অসুখের ভান করিয়া বলিলেন, 'দেখ, আমার বড় অসুখ হয়েছে, আমি মাংস খাবো না, তুমি খাও ; আমাকে কেবল হৃৎপিণ্ডটা দাও।'

গোবরা বলিল, "সে কি, মাংস খাবে না—হঠাৎ এমন কি অসুখ হলো? আচ্ছা, বেশী না খাও, একটু খেতেই হবে। আগে তোমাকে হৃৎপিণ্ডটা এনে দি।' এই বলিয়া সে খুব ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া হৃৎপিণ্ডটা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সেটা যে কোথায় গিয়াছে, পাঠক-পাঠিকার তাহা জানিতে বাকি নাই। অথচ সত্য কথাটা দূতকে বলিতেও গোবরার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরে সে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখ ভাই, অনেক খুঁজলাম, কিন্তু হৃৎপিণ্ড ত পেলাম না! বোধ হয়, পাঁঠার হৃৎপিণ্ড থাকে না।'

দেবদূত। বাঃ, সব জন্তুর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই? তা কি কখন হয়!

গোবরা। হবে না কেন? এই ত কতক্ষণ ধরে খুঁজলাম। থাকলে কি আর পাওয়া যেত না?

গোবরার কথায় দেবদূতের ভারি রাগ হইল। কিন্তু তিনি কোনও রকমে সে ভাব চাপিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা না থাকে নেই থাক, এখানে আর দেরি করা হবে না। তুমি শিগগির মাংস খেয়ে নাও।'

দূতের মুখের কথা শেষ না হইতেই গোবর্ধন টপাটপ সেই আস্ত ছাগল ছানাটির সদগতি করিল! তার পর দূতের সঙ্গে বাহির হইল।

কিছু দূর গিয়া তাঁহারা সম্মুখে একটা নদী দেখিতে পাইলেন। হাঁটিয়া পার হওয়া ভিন্ন আর উপায় ছিল না। দেবদূত যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে তিনি হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। হাঁটু পর্যন্তও ভিজিল না। কিন্তু গোবর্ধন যেই নামিয়াছে, অমনি তাহার কোমর অবধি জলে ডুবিয়া গেল এবং ক্রমশই জল বাড়িতে লাগিল। সে ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি তো খুব মজার লোক ;—আমি ডুবে মরি আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ!' দূত বলিলেন, 'পাঁঠার হৃৎপিণ্ড কোথায় গেল যদি বল, তবে তোমাকে ওঠাব!'

গোবরা দেখিল বড়ই মুশকিল। মিথ্যা কথা স্বীকার করেই বা কিরূপে? বলিল, 'আমি জানলে কি আর আগে বলতাম না!'

একেই গোবরার দেহের ভার, তাহার উপর আস্ত পাঁঠাটা তখনও পেটের ভিতর গজগজ করিতেছিল, সে ভারটাও বড় কম নয়! এই দুই ভারে গোবরা ক্রমশই ডুবিতে লাগিল। শেষে তাহার নাক অবধি জল উঠিল—প্রাণ যায় যায়।

দূত বলিলেন, 'এখনও দোষ স্বীকার কর, তা না হলে তোমার আর রক্ষে নেই!' কিন্তু গোবরা কিছুতেই দোষ স্বীকার করিল না। যাহা হউক, তাহাকে প্রাণে মারিতে দূতের ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া ফেলিলেন।

তার পর আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন সকালে তাঁহারা এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সেই দেশের রাজকন্যা অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে মারা গিয়াছে। শুনিয়া দূত বলিলেন, 'চল, রাজবাড়িতে যাই।'

রাজবাড়িতে আসিয়া দেবদূত মরা মেয়েটিকে একবার বেশ করিয়া দেখিলেন। তার পর রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, শোকে অধীর হবেন না। রাজকুমারীকে আমি বাঁচিয়ে দেবো। আমাকে একখানা কড়া, এক কলসী জল, কিছু কাঠ ও আগুন আনিয়ে দিন।'

রাজার আদেশক্রমে তখনই সমুদয় দ্রব্য আসিল। দেবদূত সেই জিনিসগুলি আর মরা মেয়েটিকে লইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন! তার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আগুন জ্বালিয়া তাহাতে এক কড়া জল চাপাইলেন এবং মেয়েটির মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া, সেই জলে সিদ্ধ করিতে দিলেন। অনেকক্ষণ সিদ্ধ হইয়া যখন হাড় হইতে সমুদয় মাংস খসিয়া পড়িল, তখন তিনি সেই হাড়গুলি লইয়া, এক স্থানে সাজাইয়া, কি এক মন্ত্র পাঠ করিলেন। অমনি দেখিতে দেখিতে তাহার উপর মাংস হইল। ক্রমে সর্বাঙ্গ চর্মে আচ্ছাদিত হইল, তার পর মেয়েটি উঠিয়া বসিল। তখন দেবদূত দরজা খুলিয়া দিলেন। রাজা মরা মেয়েকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিয়া, আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং দেবদূতকে, এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ, অর্ধেক রাজ্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু দেবদূত, রাজ্য তো দূরের কথা, সামান্য কিছু অর্থ পর্যন্ত লইতেও সম্মত হইলেন না! দূতের ব্যবহারে গোবরার বড়ই রাগ হইল। সে কৌশলে রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিল। রাজা আনন্দের সহিত তাহার ঝুলি মোহরে ভরিয়া দিলেন।

রাজবাড়ি হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গিয়া, দূত বলিলেন, 'তুমি মোহর নিয়ে ভাল কাজ কর নি! যা হোক যখন নিয়েছ, তখন এস ভাগাভাগি করি।' এই বলিয়া দূত সেই মোহরগুলি তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিন ভাগ করিবার উদ্দেশ্য কি, গোবরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগ্রহের সহিত দূতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা তো মোটে দুজন, তবে তিন ভাগ করলে কেন?'

দূত বলিলেন, 'এক ভাগ তোমার, এক ভাগ আমার, আর এক ভাগ পাঁঠার হৃৎপিণ্ড যে খেয়েছে, তার।'

দূতের মুখের কথা শেষ না হইতেই, গোবরা বলিয়া উঠিল, 'সে তো আমি—আমিই সেটা খেয়েছি। ও ভাগটা তবে আমার।'

দেবদূত। সে কি, পাঁঠার হৃৎপিণ্ড থাকে না!

গোবরা। আরে,—এও কি একটা কথা! সব প্রাণীর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই! তখন আমি মিছে কথা বলেছি!

দেবদূত। তুমি মিছে কথা বল? তবে আমি আর তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। মিথ্যাবাদীকে আমি বড় ঘৃণা করি। এ সব মোহরই তুমি নেও, আমি চললাম।

গোবরার হাতে তখন অনেক টাকা সে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। বলিল, 'তা এখন যেতে পার, এ টাকায় আমার অনেক দিন চলবে।'

দেবদূত বলিলেন, "তুমি নেহাত মূর্খ, এ টাকা কয় দিন! দু'চার বছরের মধ্যেই আবার তোমাকে ভিক্ষেয় বেরুতে হবে! যা হোক, এতদিন এক সঙ্গে আছি, তোমাকে একটা কিছু না দিয়ে গেলে ভাল দেখায় না!—এই ঝুলিটা তুমি নেও; তোমার যখন যা পেতে ইচ্ছে হবে, তার নাম করে—আমার এই ঝুলির ভিতর আয়—এই কথা বলবামাত্র সেই জিনিস তখনই তোমার ঝুলির মধ্যে আসবে।" এই বলিয়া দেবদূত গোবরাকে ঝুলিটা দিয়া এক দিকে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গোবরার দেশভ্রমণের সাধ মিটিয়া গেল। সে দেশে ফিরিয়া বুক ফুলাইয়া নবাবী আরম্ভ করিল। হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সিপাই-শান্ত্রীতে তাহার প্রাসাদ ভরিয়া গেল। বাবুয়ানার চোটে দুই-তিন বৎসর পরে তাহার হাতে আর কিছুই রহিল না। শেষে দূতের কথাই সত্য হইল।

গোবরাকে আবার ঝুলি কাঁধে করিয়া বাহির হইতে হইল। পেটের দায়ে সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া, কোন দিন দু'টি অন্ন জুটে, কোন দিন জুটে না। সুখের দিনের তেল কুচকুচে ভুঁড়ি দুঃখের পেষণে একেবারে শুকাইয়া গেল! এই সময় গোবরা একদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়াও থাকিবার মত স্থান না পাইয়া, সন্ধ্যার কিছু পরে একটা সরাইয়ে উপস্থিত হইল এবং সেইখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সরাইয়ের কর্তা বলিলেন, 'এখানে জায়গা নেই—তুমি অন্য চেষ্টা দেখো।'

গোবরা। বাঃ, তুমি ত খুব মজার লোক ! জায়গা নাই বললেই হল। এত রাত্তিরে আমি এখন যাই কোথায় ?

কর্তা। তা আমি কি জানি—যেখানে খুশি যেতে পার।

গোবরা দেখিল, লোকটা নিতান্ত বেয়াড়া। তর্কে কোনই লাভ নাই। তাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা সামনের ঐ বাড়িটা কার ?'

কর্তা। আরে বাপ রে ! ও বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে ! ওটা ভূতের আড্ডা !

গোবরা। আমার অত ভূতের ভয় নেই !—ওটা যদি তোমাদের বাড়ি হয়, তবে চাবিটা আমায় দাও, আমি ওখানে গিয়ে থাকি।

কর্তা। কেন বাপু, প্রাণটা হারাবে ! গরিবের ছেলে, মানে মানে ঘরে ফিরে যাও !

গোবরা। বেশ,—প্রাণ যায় আমার যাবে ! তুমি চাবিটা দাও।

'কিছুতেই শুনলে না, তবে মর গে !'—এই বলিয়াই কর্তা চাবিটা ছুড়িয়া দিলেন।

গোবরা একটা আলো লইয়া সেই বাড়িতে প্রবেশ করিল এবং ভাল রকম একটি ঘর বাছিয়া লইয়া তাহাতে শয়ন করিল। তার পর আন্দাজ বারটা বাজিয়াছে, এমন সময় ভয়ানক একটা শব্দে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল যে, বিকট-মূর্তি নয়টা ভূত, রক্তবর্ণ চক্ষু বাহির করিয়া, পরস্পরের হাত ধরিয়া নাচিতেছে আর নাকি সুরে চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই তাহার দিকে আসিতেছে।

ভূতগুলার বেয়াদবি দেখিয়া গোবরার বড় রাগ হইল। সে খুব জোরে ধমক দিয়া বলিল, 'এইও !—চোপরাও ! ফের চেঁচাবি ত এক ঘুসিতে মাথার খুলি ভেঙে দেবো ! যদি ভাল চাস, এখনি দূর হ !'

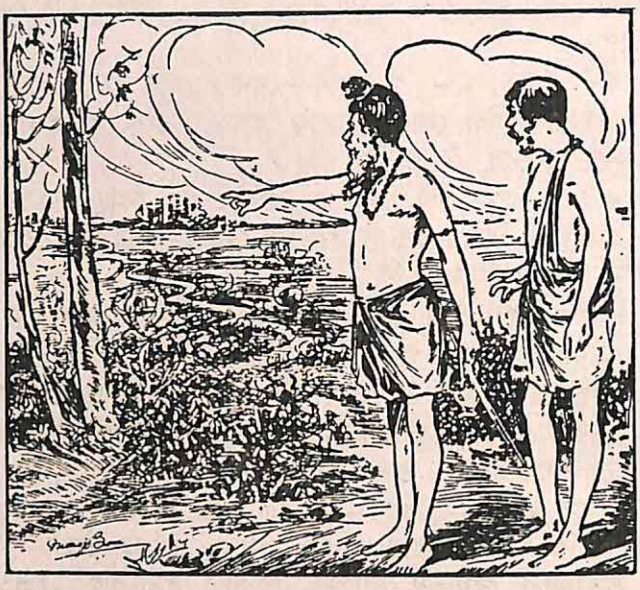
গোবরার তিরস্কারে ভয় পাওয়া দূরে থাক, ভূতগুলা নাচিতে নাচিতে একেবারে কাছে আসিয়া তাহার গায়ের উপর লাফাইয়া উঠিল এবং সর্বাঙ্গে আঁচড়-কামড় দিতে লাগিল। গোবরাও সহজ পাত্র নহে ; সে সুবিধামত দুই দুইটা ভূতের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, এমন জোরে তাহাদের মাথায় মাথায় ঠুকিয়া দিতে লাগিল যে, ভূত বাছাদের নাকালের একশেষ—এক একবার বা কয়েকটাকে ধরিয়াই দেওয়ালে এক আছাড় ! আর অমনি ঘরের ছাদ সুদ্ধ কাঁপিয়া উঠে !—এইভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু সে একা, নয়টা ভূতের সহিত কতক্ষণ পারিয়া উঠিবে ! যাহা হউক, হঠাৎ দেবদূতের সেই ঝুলির কথা তাহার মনে পড়িল। ইহার পর গোবরা যেই—'তোরা সবগুলো এইটের মধ্যে আয়'—বলিয়া ঝুলিটা বাহির করিয়াছে, অমনি দেখিতে দেখিতে সেই নয়টা ভূতই গুড়ি-সুড়ি হয়ে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ! আর গোবরাও সময় বুঝিয়া তাহার মুখ খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। বাকি রাতটুকু সে বেশ আরামেই ঘুমাইয়াছিল।



পরদিন সকালে সরাইয়ের কর্তা গোবরাকে জীবিত দেখিয়া আর তাহার মুখে ভূতের কাহিনী শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আমি মূর্খ, চিনতে না পেরে কাল কটু কথা বলেছি ; আপনি আমাকে মাপ করুন। আপনি নিশ্চিত কোন দেবতা, দেবতা ভিন্ন এ কাজ কি মানুষের দ্বারা সম্ভব !'

গোবরা। না বাপু, আমি দেবতা টেবতা কিছুই নই।—যা হক, তোমার ভূতের ভয় ঘুচলো ? এখন তবে আমি আসি।

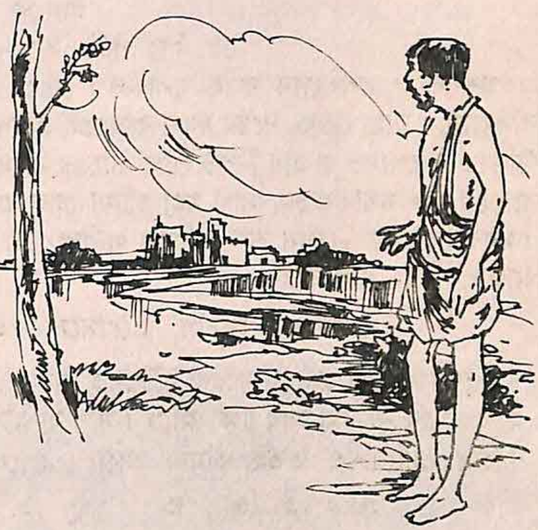
তখন কর্তা মহাশয় তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং যথেষ্ট টাকা-কড়ি পুরস্কার দিলেন। গোবরা সেই টাকা ও ঝুলি লইয়া সোজাসুজি এক কামারের দোকানে উপস্থিত। সেখানে কয়েকজন সর্দার কামারকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি যতক্ষণ না থামতে বলি, তোমরা এই ঝুলির উপর খুব ভারী মুগুর দিয়ে ঘা দিতে থাক। এজন্যে যত টাকা চাও, আমি দেব।' টাকার লোভে কামারেরা বেদম ঘা দিতে শুরু করিল। এক এক ঘা পড়ে আর অমনি ঝুলির ভিতর 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ'—মহা চিৎকার! কামারেরা তো ভয়ে জড়সড়! গোবরা তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, খুব জোরে ঘা দাও।' তাহারা সাহস পাইয়া আবার ঘা দিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় এক ঘন্টা ঘা দিবার পরেও নাকিসুরের কান্না শুনা যাইতে লাগিল। শেষে সে গোঙানিও যখন থামিয়া গেল, তখন গোবরা ঝুলির বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। ভূতদের মধ্যে একটা ছিল ভারী চালাক। চিৎকার করিলেই প্রাণ যাইবে, ইহা সে বুঝিয়াছিল, তাই চুপ-চাপ এক কোণে পড়িয়াছিল। গোবরা যেই ঝুলির বাঁধন খুলিয়াছে, অমনি সেই ভূতটা বাহির হইয়া বাদুড়ের মত ডানা মেলিয়া দে পিটটান! বাকি ভূতগুলার হাড়-গোড় চুরমার হইয়া গিয়াছিল!



ইহার কিছুকাল পরে গোবরার পরলোকে যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন রাস্তা দিয়া সেখানে যাইতে হয়, তাহা সে জানিত না। কাহাকেও যে জিজ্ঞাসা করিবে, তেমন মানুষ পাওয়া ভার। কাজেই গোবরার মনের ইচ্ছা কিছুদিন মনেই রহিয়া গেল। ইহার পর একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা মোড়ে আসিয়া দেখিল যে, পথটা সেখান হইতে দুই দিকে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহার কোনটাতে যাইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া, দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়, এক সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া গোবরা, কোন্ পথ কোথায় গিয়াছে, তাহা জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, 'এই যে সোজা বড় রাস্তাটি দেখছ, এটি নরকে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নরকে যেতে পার। আর ঐ যে ছোট আঁকা-বাঁকা রাস্তা দেখছ, ওটি স্বর্গে গেছে। ঐ রাস্তা ধরে বহুকাল চললে তবে স্বর্গে যাওয়া যায়।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া গোবরা ভাবিল, 'আমি বুড়ো মানুষ, বহুকাল যে চলতে পারি, সে শক্তি কই! তার চেয়ে এই সোজা রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি নরকেই যাই!'—এই ভাবিয়া সে নরকের পথই ধরিল। খানিক দূর গিয়া গোবরা প্রকাণ্ড একটা ফটক দেখিতে পাইল। সেই ফটক দিয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়। সে ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই যে ভূতটা তাহার ঝুলির ভিতর হইতে পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া সেখানে সে পাহারা দিতেছে। ভূত গোবরাকে দেখিবামাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে, দরজা বন্ধ করিয়া এক ছুটে তাহাদের রাজার কাছে গিয়া বলিল, "সর্বনাশ, সর্বনাশ—সেই গোবরা এসেছে! আর রক্ষা নেই! ও যদি এখানে ঢুকতে পায়, তবে আমাদের সকলকেই প্রাণে মারবে! ওর কাছে একটা ঝুলি আছে, একবার তাতে পুরে আমাদের বাছা বাছা আট জনকে মেরে ফেলেছিল!' গোবরার ঝুলির কথা শুনিয়া ভূতদের রাজার বড় ভয় হইল। যাহাতে সে কোন মতেই নরকে ঢুকিতে না পায়, তিনি একশত পালোয়ান ভূত ডাকিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

নরকের দরজা বন্ধ ! গোবরা অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া স্বর্গের রাস্তা ধরিয়া চলিল । ক্রমাগত বহুকাল চলিয়া অবশেষে সে স্বর্গের ফটকের কাছে উপস্থিত হইল ! তাহার পূর্বপরিচিত সেই দেবদূত সেখানে পাহারা দিতেছিলেন । তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গোবরার আনন্দ আর ধরে না । সে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি হে ভাই, তুমি এখানকার মালিক ? তবে তো ভালই ! একবার দরজাটা খুলে দেও আমি স্বর্গে যাই ।'



দূত বলিলেন, 'আরে-তাই তো ! এতদিন তুমি কোথা ছিলে ? ভাল আছ তো ? তা এত কষ্ট করে এলে বটে, কিন্তু ভাই, দরজা খোলবার ত হুকুম নেই ! যারা যারা এখানে আসবে, আমার কাছে তাদের নামের একটা তালিকা আছে। কই, তার মধ্যে তোমার নাম তো দেখছি না !'

গোবরা । সে কি ! তবে আমি যাই কোথা ! স্বর্গেও স্থান নেই, নরকের দরজাও বন্ধ ! আমার কি তবে কোথাও একটু জায়গা হবে না ? তোমার এই ঝুলিটাই তো যত নষ্টের মূল ! এইটে দেখতে পেয়েই নরকের দারোয়ান আমায় ঢুকতে দিলে না ! তা তুমি যদি আমাকে স্বর্গেও ঢুকতে না দাও, তোমার ঝুলিটা তবে ফিরিয়ে নেও । আমি আবার নরকে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি, কোন সুবিধে করতে পারি, কি না !'

'তা বরং দেও,'—এই বলিয়া দেবদূত হাত বাড়াইয়া যেই ঝুলি লইয়া ভিতরে রাখিয়াছেন, অমনি গোবরার মহা সুযোগ উপস্থিত ! সে মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার ইচ্ছে—এখনি ঐ ঝুলির মধ্যে যাই ।'

মুখের কথা শেষ না হইতেই, গোবরা তাহার সেই ঝুলির ভিতর গিয়া উপস্থিত ! তাহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দেবদূত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন ।

মশার যুদ্ধ

বনের ভিতর এক নদীর ধারে একদল মশা বাস করত । মশার গান বড় মিষ্ট ! এক ব্যাঙ সেই গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গেল । থপ থপ করিয়া লাফাইয়া সে প্রতিদিনই মশাদের গান শুনিতে আসিত । ক্রমে মশাদের রাজার সহিত ব্যাঙের খুব বন্ধুত্ব হইল এবং সেও যে একজন মস্ত ওস্তাদ, তাহার পরিচয় দিতে ছাড়িল না ! এখন তাহাদের মজা দেখে কে ! কখন মশারা গান গায়, সে বসিয়া বসিয়া ঘাড় নাড়ে ; আবার কখন-বা সে গায়, মশারা বাঁশি বাজাইতে থাকে ! এইভাবে কিছুকাল বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিল । তারপর একদিন ব্যাঙের বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত । সেবার বড়ই দুর্বৎসর । ব্যাঙের হাতে একটি কানাকড়িও নাই । সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মশাদের রাজার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা ধার করিয়া, পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইল । ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল ব্যাঙ আর সে দিকেও তাকায় না, কিংবা দেনা পরিশোধের নামও করে না ! মশাদের রাজা কতবার তাহার কাছে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়া দূরে থাক, সে লোকগুলোকেই বরং অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল । রাজা প্রমাদ গনিয়া নিজেই একদিন গুনগুন করিতে করিতে ব্যাঙের কাছে উপস্থিত । তিনি মিনতি করিয়া বলিলেন,—

'কুঁয়ো ব্যাঙ, কুঁয়ো ব্যাঙ,
আঁমার কঁড়ি দেঁও !—আঁমার কড়ি দেঁও !'

ব্যাঙ তো চটিয়াই লাল ! সে গর্তের ভিতর হইতে বলিল—

'গ্যাঁ-গোঁ ! গ্যাঁ-গোঁ !
কেঁ কাঁর কঁড়ি ধাঁরে—কেঁ কাঁর কঁড়ি ধাঁরে ?'



মশকরাজ দেখিলেন বড়ই মুশকিল ! ব্যাঙ তাঁহার সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে। যাহা হউক, দুষ্টের দমন করিতেই হইবে, ভাবিয়া তিনি উড়িতে উড়িতে সাপেদের রাজার নিকট গিয়া ব্যাঙের নামে নালিশ করিলেন। ধূর্ত ব্যাঙের বিশ্বাসঘাতকতায় সাপ মহা চটিয়া গেল এবং ফণা বিস্তার করিয়া, এমনভাবে ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল যে, ঠিক যেন সে রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে,—

রোসসো—আসসি, রোসসো—আসসি !'

তারপর সাপ হন হন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাঙটাকে ধরিয়া ফেলিল। যমের মুখে পড়িলে আর রক্ষা আছে ! সাপ ব্যাঙটাকে যতই গিলিতে থাকে, তাহার গোঙানিও ততই কমিয়া আসে। শেষে—

'কঁড়ি নেঁ—কঁড়ি দিঁ, কঁড়ি নেঁ—কঁড়ি দি।'

—বলিতে বলিতে সব শেষ ! সাপের সুবিচারে মশকরাজ বেজায় খুশি হইলেন।

আর একটা মশার গল্প বলি। সে অনেক দিনের কথা—বর্ধমান যাইবার জন্য একদিন বিকেলে আমি বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। ইচ্ছা করিলে, রেলগাড়িতে যাইতে পারিতাম, কিন্তু পথে নানাস্থান দেখিতে দেখিতে যাইব ভাবিয়া, রেলে চড়িলাম না, আমি খুব খানিক দূর গিয়া, একটি লোককে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই বর্ধমান সহর আর কত দূর ?"

'আপনি বর্ধমান যাবেন ? রেলে গেলেন না কেন ? হেঁটে আজ বর্ধমান পৌছান অসম্ভব, বিপদের আশঙ্কাও আছে।' এই বলিতে বলিতে লোকটি চলিয়া গেল।

আমি অনেক দিন সেই পথে সহরে যাই নাই সত্য, কিন্তু রাস্তাটা একেবারে আমার অজানা ছিল না। আমি পথিকের কথায় হতাশ না হইয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও বেশী অন্ধকার হয় নাই। আমি একটা ছোট জঙ্গল পার হইয়া, খোলা মাঠে পৌঁছিয়াই বর্ধমানের শাদা শাদা বাড়ি দেখিতে পাইলাম। 'আর কি, এই তো এসে প'ড়েছি'—ভাবিতে ভাবিতে খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। সম্মুখের পথ অনেক দূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার কেবল সহরের নিকটে একটা ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল পার হইয়া, আর একটু গেলেই রাজপথে উপস্থিত হওয়া যায়। চলিতে চলিতে আমি প্রায় সেই জঙ্গলের কাছে গিয়াছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, একখানা গরুর গাড়ি আসিতেছে। গাড়িখানা খুব কাছে আসিল, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হে বাপু, বর্ধমান সহর আর কত দূর, বলতে পার ?'

'আপনি কি এই জঙ্গল দিয়ে বর্ধমান যাবেন ?

'হাঁ, এইটেই ত সোজা রাস্তা।'

'সোজা বটে। কিন্তু পথটা সোজা বলেই কি যমের মুখে যেতে হবে ? আমার কথা শুনুন, এ পথ ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরুন। তা না হলে আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।'

তাহার কথায় আমি ভারি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কি, রাস্তায় কিসের ভয় ? ডাকাত আছে না কি ?'

'ডাকাত ? এক আধটা নয়, লক্ষ লক্ষ ডাকাত এই জঙ্গলে বাস করে। সাবধান, আপনি আর এক পা-ও এগোবেন না !—ঐ শুনুন, তারা হুঙ্কার দিচ্ছে' !

তাহার কথায়, অতি মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া, আমি ঝিঝিপোকার চিৎকার ও মধ্যে মধ্যে কুকুরের অতি ক্ষীণ ডাক শুনিতে পাইলাম। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে কিছুই বুঝিলাম না।

গাড়োয়ান আমার ভাবগতিক দেখিয়া বলিল—'শুনতে পেলেন না ? বোধ হয়, তারা মাঝে একবার থেমেছিল। আচ্ছা, আবার খুব মন দিয়ে শুনুন দেখি !'

এইবার আমি অতি কর্কশ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। অসংখ্য মশা এক সুরে শব্দ করিলে যেমন বোধ হয়, এও কতকটা সেই ধরণের। বোধ হইল যেন, 'সমুদয় জঙ্গল হইতে সেই শব্দ আসিতেছে। আমি বলিলাম, 'তুমি কি মশার কথা বলছ ?'

আজ্ঞে, মশার কথাই বলছি। যদি বাঁচবার সাধ থাকে, এ পথে সহরে না গিয়ে বড়ি ফিরে যান।'

'কি, মশার ভয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাব ? তুমি তামাশা করছ নাকি ?'

'আচ্ছা, তবে যান, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না।'

আমি তাহাকে পাগল মনে করিয়া দ্রুত পদে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটু পরেই দেখি, ঘন মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য মশা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, আমি যত তাড়াতাড়ি যাই, মশার দল তাহার চেয়েও জোরে ছুটিয়া নিষ্ঠুরভাবে আমাকে কামড়াইতে লাগিল। হাতে মুখে চাপড় দিয়া আমি এক একবারে শত শত মশা মারি, পরক্ষণেই দলে দলে অন্য মশারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে থাকে। শেষে মশার ঝাঁক এত বাড়িয়া গেল যে, আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।



শুধু হাতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব জানিয়া, আমি তাড়াতাড়ি গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইলাম এবং উহা ঠিক লাঠির ন্যায় ঘুরাইয়া মশা তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। বহুকাল উপবাসের পর, তাহারা মনের আনন্দে পেট ভরিয়া আমার গায়ের রক্ত শুষিতে লাগিল। আর রক্ষা নাই দেখিয়া আমি ডাল ফেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলাম, তবুও নিষ্কৃতি নাই। সেই নিষ্ঠুর দস্যুরাও, পাছে শিকার হাতছাড়া হয় এই ভয়ে, এমনভাবে আমাকে তাড়া করিল যে, আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পাগলের ন্যায় লাফালাফি করা ছাড়া আমার আর উপায় রহিল না ! তারপর কোথায় গেলাম, কি হইল, এ সব কথা আমার একটুও মনে নাই। শেষে যখন অল্প অল্প জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি সহরের একটি রাস্তার পাশে পড়িয়া আছি। শরীর অবসন্ন, চক্ষে তেমন তেজ নাই ; আর হাত, পা, নাক, মুখ, কাপড়-চোপড় একেবারে রক্তারক্তি। যাহা হউক, কোন রকমে খাড়া হইয়া আমি টলিতে টলিতে একটা হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ইহার পর তিন দিন আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারি নাই। তিন দিন পরে কতকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে মশা দেখিলেই আমার ভয় হয়। ইহারা সামান্য প্রাণী বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য প্রাণীর গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ নহে।

জয়-পরাজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন আমার বয়স বার বৎসর। একদিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মোহনলাল, দেখতে দেখতে তুই বড় হয়ে উঠলি। আর হেসে খেলে সময় নষ্ট করলে চলবে না। কালই তোকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেব।'

এত বয়স পর্যন্ত স্কুলে ভরতি হই নাই শুনিয়া, কেহ কেহ হয় ত আশ্চর্যই বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। প্রথম, আমি নেহাত গরিব লোকের ছেলে নই,—ঘরে অন্নের বিশেষ অভাব ছিল না। দ্বিতীয়, আমি মায়ের একমাত্র সন্তান,—আবদারের সীমা ছিল না। তৃতীয়, নিতান্ত শিশু অবস্থায় আমি পিতৃহীন হই,—শাসন করিবার কেহই ছিল না। কাজেই এমন সুযোগের মধ্যে পড়িলে, কোন বালকই বা বার বৎসরের পূর্বে স্কুলে ভরতি হয়! আমি মায়ের আদুরে গোপাল হইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতাম। মাকে বেলা দুপুর পর্যন্ত ফাঁকি দিয়া, বাগানে বাগানে পাখির ছানা খুঁজিয়া বেড়াইতাম; কখন সমবয়সীদের সঙ্গে জুটিয়া প্রতিবেশীর বাগানে পাকা কুল, বাতাবি লেবু, কাঁচা আম, কচি শশা প্রভৃতি চুরি করিতে যাইতাম। কখন জেলের ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়াও নদীতে নৌকা চড়িয়া বেড়াইতাম; কখন বা নদীর চড়ায় গিয়া চড়িভাতি করিতাম। একদণ্ড আমাকে বাড়িতে কেহ স্থির হইয়া থাকিতে দেখে নাই। দুপুরবেলা মা আমাকে 'হাসিখুসি' ও স্লেট পেনসিল দিয়া বসাইয়া দিতেন, কিন্তু আমি তাঁহার চোখে ধুলা দিয়া, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গিয়া মিশিতাম এবং ডাণ্ডা-গুলি ও কপাটি খেলায় সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিতাম।

আমি আরও কয়েক বৎসর হাসিয়া খেলিয়া কাটাইতে পারিতাম, কিন্তু পাড়ার কয়েকটি দুষ্টু ছেলের সহিত আমার কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে, মা বড়ই ভয় পাইলেন এবং স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সঙ্গে আমার বেড়ান বন্ধ হইবে, এই ধারণায় তিনি পরদিনই আমাকে স্কুলে ভরতি করিয়া দিলেন। মায়ের বুঝিবার নিতান্তই ভুল হইয়াছিল। স্কুলে গিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি অনেকগুলি কুসঙ্গী পাইলাম এবং তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, স্কুল হইতে পলাইয়া, বাগানে বাগানে ঘুরিয়া, পাখির ছানা ও ফলমূল চুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

স্কুলেও আমার মন্দ স্বভাবের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল; আমাদের ক্লাসে নেপাল ও মণিরাম নামে দুইটি ছেলে ছিল। নেপাল আমার সমবয়স্ক, মণিরামের বয়স নিতান্ত অল্প এই দুই জনের সঙ্গে আমার একেবারেই বনিত না—প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হইত। মণিরাম বয়সে ছোট বলিয়া অনেক সময়, এমন কি, বিনা দোষে তাহাকে প্রহার করিতাম। কিন্তু মনে মনে খুব রাগ থাকিলেও, নেপালের উপর কোন অত্যাচার করি, এমন সাহস আমার ছিল না।

ক্লাসের প্রায় সকলেই আমাকে ও নেপালকে ভয় করিত। তাহার কারণ, নেপালের ভালবাসা ও আমার অত্যাচার। নেপাল সকলকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সম্মুখে কোন অন্যায় কাজ করিতে কাহারও সাহস হইত না; আর আমার অত্যাচার-প্রবৃত্তি এমনই প্রবল ছিল যে, আমাকে ভয় না করিত, এমন ছেলে ক্লাসে কেহ ছিল না। এমন কি, আমি কোন অত্যাচার করিলেও শিক্ষককে বলিয়া দিতে কেহ সাহস করিত না।

অভ্যাসমত একদিন আমি মণিরামকে ধরিয়া দুই চারি ঘা দিতেছি, এমন সময় নেপাল আসিয়া বলিল 'দেখ ভাই, মণিরাম একে ছোট, তাতে আবার ভারী রোগা। আর তুমি তার চেয়ে কত বড়! মণিকে মারা কি তোমার ভাল দেখায়!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এ বিষয়ে তোমার কোন কথা বলবার দরকার নেই। জ্যেষ্ঠতাতের মত উপদেশ দিচ্ছ কেন! মণিকে মারছি সে বুঝবে, মাঝখান থেকে তোমায় ফোড়ন দিতে ডাকলে কে?'—এই বলিয়া রাগের চোটে আমি মণিরামের ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিলাম।

আমার অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নেপাল সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি ভাবিলাম, নেপাল নিশ্চিতই ভীরু। ভীরু না হইলে সে কখনও চুপ করিয়া বলিয়া যাইত না।

সেই দিন হইতে নেপালের উপর আমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ক্লাসের অন্যান্য বালকের উপর আমি এত দিন যেরূপ প্রভুত্ব করিয়াছি, মিথ্যা ভয়ে নেপালের উপর সেরূপ করিতে সাহস করি নাই বলিয়া, মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল ! ভাবিলাম, এবার সুবিধা পাইলেই নেপালকে উত্তম-মধ্যম ঘা কতক দিতে হইবে। তখন হইতে নেপাল যাহাতে চটে, আমি বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ কাজ করিতে লাগিলাম।

ঝগড়া বাঁধাইবার জন্য বড় বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না ! আমাদের স্কুলে যাইবার পথে, এক কৃষকের বাগানে কয়েকটি লিচু গাছ ছিল। তখন জৈষ্ঠ্য মাস। গাছগুলি লিচুতে ভরিয়া গিয়াছিল। একদিন স্কুলে আমরা কয়েকজনে পরামর্শ করিলাম যে, সেই বাগানের লিচু খাইতে হইবে। আমাদের মধ্যে মণিরাম বেশ গাছে উঠিতে পারিত। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'দেখ মণি, আজ লিচু পেড়ে খাবো, তুই গাছে উঠবি, কেমন ?' মণিরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা।'

স্কুলের ছুটি হইলে আমরা দল বাঁধিয়া, কৃষকের লিচু গাছের তলায় জড় হইলাম। কৃষক তখন বাড়িতে ছিল না। আমি মণিরামকে গাছে তুলিয়া দিয়া সকলকে পাহারা দিতে বলিলাম। মণিরাম সবেমাত্র দশ বারটা লিচু পাড়িয়াছে, এমন সময় বৈদ্যনাথ আসিয়া বলিল, 'ওহে মোহনলাল, ব্যাপার বড় সহজ নয় ! নেপাল দলবল নিয়ে এই দিকে আসছে। বোধ হয়, মারামারি হতে পারে।' আমি বলিলাম 'কি, নেপাল আসছে ? আসুক, আজ তাকে একবার দেখাবো ! তোমরা এই দিকে থাকো, আমি ঐ গাছের আড়ালে লুকাই। খবরদার, তোমরা ভয় পেও না। আমি ঠিক সময়ে বাইরে এসে নেপালকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেবো। তোমরা তার চেলাদের মাথায় চড়টা-আসটা দিতে ভুলো না।' আমার কথায় সকলে রাজী হইল ; আমি গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইলাম।

একটু পরেই নেপালের দল গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিরাম তখন ভয়ে নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নেপাল বলিল, 'ছিঃ মণি, তোমার এই কাজ ! আমি তোমার মাকে বলে দেব।'

মণিরাম ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'না ভাই, আমার কোন দোষ নেই। তুমি তো জান, শুধু মার খাবার ভয়েই আমি এ কাজ করতে রাজী হয়েছি।'

নেপাল। তা জানি, আসল ব্যাপার বুঝতে আমার বাকী নেই। ছিঃ ! ছিঃ ! এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে !

নেপালের কথা শেষ হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ সগর্বে বলিয়া উঠিল, 'সাবধানে কথা বল, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় !'

নেপালের দলে গোপীনাথ নামে একটি ছেলে ছিল। তাহার চেহারা যেমন গুণ্ডার মত, তাহার গায়ের জোরও তেমনি বেশী। সে বৈদ্যনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি, সাবধান হব ? কেন, এত ভয় কিসের ? আয় না, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখি !' এই বলিয়া গোপীনাথ যেই একটু অগ্রসর হইল, লিখিতে লজ্জা হয়, আমার দলের সকলেই অমনি প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দলের ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া আমি যারপরণাই দুঃখিত হইলাম। এক একবার ভাবিলাম, ছুটিয়া গিয়া নেপালের মুখে এক ঘুসি লাগাই। কিন্তু গোপীনাথের ভয়ে আমারও সাহস হইল না। আমি যেমন লুকাইয়া ছিলাম, তেমনি রহিলাম। তখন নেপাল মণিরামকে ডাকিয়া বলিল, 'নেমে এস, এমন কাজ আর কখনও করো না।'

মণিরাম ধীরে ধীরে নামিয়া বাড়ির দিকে চলিল। নেপালের দলও অন্য একটি রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অনেক দূর যাইলে পরে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিলাম। সেই দিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, নেপালকে ইহার প্রতিশোধ দিবই দিব। তাহা যদি না পারি, আমার মোহনলাল নাম মিথ্যা !

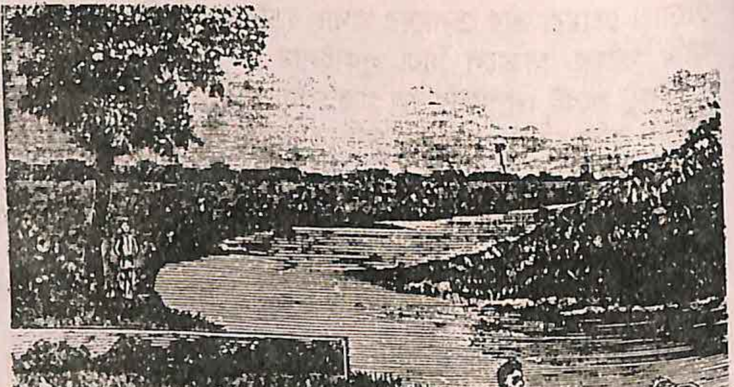
ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই নেপালকে মারিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন স্কুলের ছুটির পর

নদীর ধার দিয়া যাইতে যাইতে, আমি নীচে বই রাখিয়া, একটা গাছে পাখির ছানা পাড়িতে উঠিয়াছি, এমন সময় নেপাল, মণিরাম এবং আমাদের ক্লাসের আরও কয়েকটি ছেলে সেখানে আসিল। গাছের তলায় বই দেখিয়া নেপাল বলিয়া উঠিল, 'এই দেখ, কোন হতভাগা ছেলে বই ফেলে গেছে ! কার নাম লেখা আছে, খুলে দেখ তো ?'

আমি গাছের উপর হইতে বলিলাম 'কি, এত বড় আস্পর্ধা ! তুই আমাকে হতভাগা বলবার কে ? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি !' এই বলিয়া আমি তিন-চারিটি ডিম সুদ্ধ পাখির বাসাটা নেপালের মুখের উপর ছুড়িয়া দিলাম, ডিমগুলা ভাঙিয়া তাহার নাক, মুখ রসে ভরিয়া গেল ; নেপালের মুখের শ্রী দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, 'এখন তোর "গুপে" কোথায় ? সেদিন যে বড় মারামারি করতে চেয়েছিলি ! আয় তিন ঘুসিতে এখনই তোর দাঁত উড়িয়ে দেবো।'

'মারামারি করা ভদ্রলোকের কাজ নয় ! যতক্ষণ ভাল কথায় চলে ততক্ষণ মারামারি না করাই উচিত। কিন্তু তুমি ক্রমেই যে রকম বাড়িয়ে তুলছ, তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমি মিষ্টি কথা বলে দেখেছি, ভাল ব্যবহার করে দেখেছি, তুমি কিছুতেই শুনলে না। যেন মারামারি করাই তোমার উদ্দেশ্য ! যদি তাই হয়, এস, দেখা যাক !' এই বলিয়া নেপাল তাহার জামার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া, নেপালের মুখ লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক ঘুসি চালাইলাম ! সে হঠাৎ মাথা সরাইয়া সেই ঘুসি এড়াইল। তখনই আবার আর একটা ঘুসি মারিলাম, সেটাও তাহার গায়ে লাগিল না। রাগে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া আমি আবার তাহাকে মারিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়, নেপালের প্রকাণ্ড এক ঘুসি ঠিক আমার নাকের উপর আসিয়া পড়িল ! সে তো ঘুসি নয়, যেন লোহার মুগুর ! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম ! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।



আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নেপালের সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ নয়। সে একজন রীতিমত পালোয়ান। তখন আমি—'যাক্ প্রাণ, থাক মান'—মন্ত্র জপিতে জপিতে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। নেপাল চক্ষুর নিমিষে অমনি একধারে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, আর বেগ সামলাইতে না পারিয়া আমি সম্মুখের নদীতে পড়িয়া গেলাম। নদীটা বড় না হইলেও গভীর ছিল। আমি সাঁতার জানিতাম না ; নদীতে পড়িয়া আঁকুপাঁকু করিতে করিতে ভাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল ! আমার এই আসন্ন বিপদে নেপাল স্থির থাকিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমিও তাহার কাপড় ধরিলাম। নেপাল বলিল, 'তোমার কোন ভয় নাই ; কাপড় ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এখনি উঠাচ্ছি।'

কিন্তু তাহার কাপড় ছাড়িতে আমার সাহস হইল না ; কি জানি, শত্রু ভাবিয়া সে যদি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। আমার নির্বুদ্ধিতায় লাভের মধ্যে এই হইল যে আমরা দুইজনেই ডুবিতে লাগিলাম। শেষে নেপাল জোর করিয়া আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া লইল এবং অনেক কষ্টে আমাকে লইয়া

ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া উঠিল। এইরূপে আমি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

কিন্তু কুশিক্ষার এমন দোষ যে, সে সময়েও আমি নেপালকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিলাম না। সে যে আপনাকে এত বিপদে ফেলিয়া, আমার জীবন-রক্ষা করিল, সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, বরং অপমানে যেন আমি মরিয়া গেলাম! নেপাল এই ঘটনা লইয়া যেখানে সেখানে গর্ব করিবে, আর সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট হইবে,—ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও অপমানের বিষয় কি আছে! নদীর জলে ডুবিয়া মরাই বরং আমার পক্ষে সহস্র গুণে ভাল ছিল! এই ভাবিতে ভাবিতে আমি বাড়ি চলিয়া গেলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ি আসিলে, নেপালের প্রতি আমার অন্যায় ব্যবহার কথা শুনিয়া, মা আমাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন। তারপর কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠানো স্থির করিলেন। ১২৮২ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে, ১৫ বৎসর বয়সের সময়ে আমি মামার সহিত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত বয়স পর্যন্ত আমি কখনও বাড়ির বাহির হই নাই। সেই জন্য ট্রেনে উঠিয়া প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিবার পরে, দিন কয়েক মামার সঙ্গে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, গড়ের মাঠ, কেল্লা প্রভৃতি দেখিয়া, সে কষ্টের অবসান হইল। রোজ সকালে বিকালে চারিদিক থেকে কত বাঁশী বাজে, কত হারমোনিয়ম বাজে, কত গোরার বাজনা বাজাইয়া, রোশনাই করিয়া বিয়ে যায়—এই সব আমার কাছ খুব নূতন বোধ হইতে লাগিল। মামা আমাকে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়া, এক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমি বোর্ডিং-এর ভাল ছেলেদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসিতাম না। কয়েকটি ওঁচা ছেলে আমার সঙ্গী হইল। আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া চুরুট খাইতে শিখিলাম। বড় বড় 'হনি সোপ' কিনিয়া গায়ে মাখিতাম, আর প্রত্যহ একঘণ্টা ধরিয়া ঝাঁঝরা কলের নিচে মাথা পাতিয়া, আনন্দে স্নান করিতাম। তারপর অরসি বুরুশ লইয়া, আলবার্ট কাটিয়া চুল ফিরাইতাম। ভাল ভাল চুনট করা কামিজ, চীনে বাড়ির বার্নিস করা হাপ-জুতা, হাপ মোজার উপর গার্টার, এই সব অষ্টপ্রহর পরিয়া বাবুগিরি করিতাম। বোর্ডি-এ আমার স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশ বাধা পাইতে লাগিল। বোর্ডিং স্কুলের বাধা-বাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করা যে কি ভয়ানক কষ্টকর, তাহা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক মাস যাইতে না যাইতে, আমি পর পর সাত বার নিয়মভঙ্গ-অপরাধে তিরস্কৃত হইলাম। বোর্ডি-এ আমার সমবয়স্ক আরও কয়েকটি বালক ছিল। তাহাদের মধ্যে রমানাথ দুষ্টামিতে সর্বাপেক্ষা পাকা। তাহার সহিত আমার খুব ভাব হইল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত ভাব দেখিয়া, হেডমাস্টার মহাশয় নিয়ম করিয়াছিলেন যে, আমরা কেহ কাহার সহিত কথা বলিতে পারিব না। কিন্তু মাস্টারের চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি আমাদের যথেষ্ট ছিল। আমরা গোপনে একত্র হইয়া সর্বপ্রকার দুষ্টামির মতলব আঁটিতে লাগিলাম। লেখাপড়াও যে কিছুই শিখিলাম না, এমন নয়। তখন আমি গড়গড় করিয়া 'রয়েল রীডার থ্রি' পড়িতে পারিতাম; এক টানে আমার নাম লিখিতে পারিতাম; অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও নিতান্ত কম হয় নাই,—হড়হড় করিয়া কুড়ির কোটা পর্যন্ত নামতা মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এইরূপে একটু লেখাপড়া এবং অনেকখানি দুষ্টামি শিখিয়া আমি পূজার ছুটির সময় বাড়িতে আসিলাম। পূজার কয়দিন বেশ কাটিয়া গেল, মা কিছুই বলিলেন না। কিন্তু বিজয়ার পরদিনই মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মোহনলাল, এই কয় মাস কলকাতায় থেকে তুমি তোমার শিক্ষকের এবং বোর্ডিং-এর ছেলেদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, তা সবই আমি শুনেছি। তোমার মামাকে মাস্টার মশাই যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। তুমি এখন আর ছেলেমানুটি নও, বড় হয়েছ; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখনও তুমি কুসংসর্গ ছাড়তে পারলে না! যা হক, আমি আর তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তোমার যা ইচ্ছে, তাই করো।' এই বলিয়া মা চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, মা যাহাতে কষ্ট পান, এমন কাজ আর কখন করিব না। আমার ভাবগতিক দেখিয়া মাও বোধ করি ভাবিলেন যে, আমার সুমতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। তারপর যে

কয়দিন বাড়িতে ছিলাম, আমার সে কয়দিনের ব্যবহার দেখিয়া মা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে ছুটি ফুরাইয়া আসিলে, মা আমাকে আদর করিয়া, নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া, আবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

ছুটির পর বোর্ডিং-এ ফিরিয়া আসিয়া দেখি, যেন সব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আমি যে ঘরটাতে থাকিতাম, সে ঘর মেরামত হইতেছে, আমার জন্য অন্য একটা ঘরে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য কয়েক জন বালকের ঘরও বদলাইয়া গিয়াছিল। রমানাথ আমার আসিবার একদিন পূর্বে বোর্ডিং-এ ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি যে দিন আসি, সেই দিন বিকালে রমানাথ আমাকে চুপি চুপি বলিল, 'দেখ মোহনলাল, আজ একটা মজা করতে হবে, তাতে তোমার সাহায্য চাই। তুমি বোধ হয় জান, ছোট কুঞ্জ রাক্ষসের কথা শুনলে বড় ভয় পায়। কেউ রাক্ষসের গল্প বললে কুঞ্জ তার কাছেও যায় না ; আজ রাত্রে কুঞ্জকে নিয়ে একটু মজা করবো। আমি দুটো রাক্ষসের মুখোস কিনে এনেছি। কুঞ্জ ঘুমুলে আমরা রাক্ষস সেজে তাকে গিয়ে ভয় দেখাবো। কেমন, তুমি রাজি আছ তো ?'

রমানাথের কথায় কোন উত্তর দিবার পূর্বেই মায়ের চোখের জলের কথা আমার মনে পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইহা ত দুষ্টামি নয়—একটু মজা করা মাত্র ! এতে দোষ কি ! এই ভাবিয়া রমানাথকে বলিলাম, 'আচ্ছা, আমি রাক্ষস সাজবো, কিন্তু ভাই, খুব সাবধান—মাস্টারমশাই যেন টের না পান।'

'আরে সে ভাবনা নেই। মাস্টারমশাই আমাদের কোন কাজটাই বা জানতে পারেন !' এই বলিতে বলিতে রমানাথ অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত প্রায় বারোটা বাজিলে ক্লাসের কয়েকজন ছেলে আমাদের দুইজনকে, বেশ ভাল করিয়া রাক্ষস সাজাইয়া দিল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের বোর্ডিংগৃহ মেরামত হইতেছিল, বাড়িতে অনেক খড়ের দড়ি ছিল। সুতরাং আমাদের এক একটি ল্যাজেরও অপ্রতুল হইল না। আমরা বিকট মূর্তি ধরিয়া বাতি হাতে পা টিপিতে টিপিতে ছোট কুঞ্জের ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রমানাথ চাবি ঘুরাইবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। তখন বাতি নিবাইয়া ভূতের মত অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়া, আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তারপর পশ্চিম দিকের জানালা খুলিয়া দিলাম। ঘরে বেশ চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল। কুঞ্জের বিছানা ঘরের এক কোণে ছিল বলিয়া, কেবল সেইখানটায় আলো পৌঁছিল না। আমরা কুঞ্জের নাক ডাকার শব্দে বুঝিলাম, সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

পূর্বের বন্দোবস্ত অনুসারে রমানাথ ও আমি একসঙ্গে লাফাইয়া কুঞ্জের উপর গিয়া পড়িলাম। সে হাঁউ-মাঁউ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, আমরাও ততই তাহাকে ল্যাজের বাড়ি মারিতে মারিতে, বিকট শব্দ করিয়া বলিলাম, 'আঁমরা রাঁক্ষস, তোঁকে গিলে খাঁবো !'

আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই, কুঞ্জ জানালার ধারে জ্যোৎস্নাতে আসিয়া দাঁড়াইল।—কি সর্বনাশ ! সহস্র বজ্র যেন একেবারে আমাদের মাথার উপরে পড়িল ! চারিদিক অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল ! এ তো কুঞ্জ নয় ! এ যে দেখি, আমাদের হেডমাস্টার ! হেমাস্টারকে দেখিয়া, আমাদের হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তবুও আমরা প্রাণভয়ে ছুটিয়া ঘরে আসিয়া লুকাইলাম।

বাকি রাতটা যে কি ভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। এমন কোন ভাষা নাই, যাহাতে ঠিক আমাদের মনের ভাব প্রকাশ হয়। সকাল হইলে কি করিব, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরা গায়ের রং ধুইয়া, দুইটিতে মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। মুখোস আগেই পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।

পরদিন ভোর না হইতেই, বোর্ডিংময় রাষ্ট্র হইল যে, দুইটি ছেলে মুখোস পরিয়া রাত্রে হেডমাস্টারকে খুন করিতে আসিয়াছিল। সেই ছেলে দুইটি কে কে, জানিবার জন্য মাস্টার মহাশয় বোর্ডিং-এর সব ছেলেকে একত্র হইতে বলিলেন। আমরা যত দূর সম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া সকলের সঙ্গে গিয়া বসিলাম ; এবং যাহারা আমাদের কীর্তি জানিত, ইঙ্গিতে তাহাদিগকে কোনও কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, নিরীহ বালকের ন্যায় মাস্টার মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছু পরেই বোর্ডিং-এর সম্পাদক ও হেডমাস্টার মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কে

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২